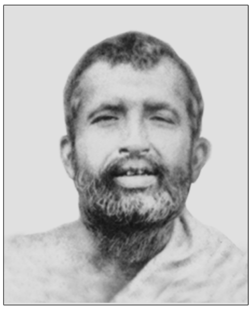

শ্রীরামকৃষ্ণের ঐশ্বর্যবিহীন লীলা

স্বরাজ মজুমদার

সাদামাটা ভাষায় 'লীলা' মানে রঙ্গ, কৌতুক, রগড় বা খেলা—ভগবানের খেলা। ভগবান ভক্তের সঙ্গে নানাভাবে খেলছেন, আনন্দ করছেন। ভক্তও ভগবানের সঙ্গে খেলছেন। স্বামীজী এই সত্য উপলব্ধি করেই বলেছেন, 'We are the play-mates of the Mother'—আমরা জগন্মাতার খেলার সাথী। জ্ঞাতসারে অথবা অজ্ঞাতসারে আমরা তাঁর খেলায় অংশ নিচ্ছি, খেলায় মেতে খেলাটিকে পুষ্ট করছি। স্বামীজী ফ্রান্সিস লেগেটকে মন খুলে লিখছেন (৬ জুলাই, ১৮৯৬), "তিনি আমার সদালীলাময় আদরের ধন, আমি তাঁর খেলার সাথী। এই জগতের কাণ্ডকারখানার কোনখানে কোন কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না—সব তাঁর খেলা; সব তাঁর খেয়াল। কোন্ কারণে তিনি আবার যুক্তির দ্বারা চালিত হবেন? লীলাময় তিনি—এই জগৎ-নাট্যের সব অংশেই তিনি এই সব হাসিকান্নার অভিনয় করছেন।... এ তো বড় মজার জগৎ! আর সকলের চেয়ে মজার লোক তিনি—সেই অনন্ত প্রেমাস্পদ প্রভু! সব জগৎটা খুব মজার নয় কি? আমাদের পরস্পরে ভ্রাতৃভাবই বলো আর খেলার সাথীর ভাবই বলো, এ যেন জগতের ক্রীড়াক্ষেত্রে একদল স্কুলের ছেলেকে খেলতে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে, আর সকলে চেঁচামেচি করে খেলা করছে! তাই নয় কি? কাকে সুখ্যাতি করব, কাকে নিন্দা করব? এ যে সবই তাঁর খেলা। লোকে জগতের ব্যাখ্যা চায়, কিন্তু তাঁকে ব্যাখ্যা করবে কেমন করে? তাঁর তো মাথা-মুণ্ডু কিছু নেই—বিচারের কোন ধার ধারেন না। তিনি ছোটখাটো মাথা বা বুদ্ধি দিয়ে আমাদের বোকা সাজিয়েছেন...।"

অন্যভাবে দেখলে ভগবান অনন্তকাল ধরেই স্বেচ্ছায় 'জীব' সেজে নিজের সঙ্গেই নিজে খেলে চলেছেন। কেন? সে প্রশ্ন করার উপায় নেই। তাঁর ইচ্ছা। এটিই লীলার অনির্বচনীয়তা। এটিই লীলার মাধুর্য। শ্রীরামকৃষ্ণ তাই ভক্তদের বলছেন, লীলাও সত্য—অনন্তকাল ধরে এই লীলা চলছে, চলবেও অনন্তকাল। তিনি আরও বলছেন, "এ সংসার তাঁর লীলা; খেলার মতো। এই লীলায় সুখ-দুঃখ, পাপ-পুণ্য, জ্ঞান-অজ্ঞান, ভাল-মন্দ—সব আছে। দুঃখ, পাপ—এ-সব গেলে লীলা চলে না।"[১] বলেছেন, বুড়ির ইচ্ছা।

এখন প্রশ্ন : রঙ্গরসপ্রিয় এই আদ্যিকালের বদ্যি বুড়িটি কে, যিনি জটিলা-কুটিলা নিয়ে লীলা পোষ্টাই করছেন? ভক্তিশাস্ত্র বলেন, বুড়ি হচ্ছেন ত্রিগুণাত্মিকা মহামায়া, জগৎ-চালিকা আদি শক্তি বা সগুণ ঈশ্বর।

তাঁর মায়াতেই এই জগৎসংসাররূপ ভেলকি। তাঁর মায়াতেই আমাদের কাঁচা-আমিত্ববোধ। তাঁর মায়াতে আচ্ছন্ন হয়ে মন-বুদ্ধি-চিত্ত-অহংকার সব ভিন্ন ভিন্ন ভাবে কাজ করে চলেছে। তার ফলেই এই দৃশ্যমান খণ্ডজগতের প্রতীতি হচ্ছে, বৈচিত্র্যের বোধ হচ্ছে, সুখ-দুঃখ অনুভূত হচ্ছে, বন্ধন-মুক্তির অনুভব হচ্ছে। এটি মনের রাজ্য বা দ্বৈতভূমি। এই ভূমিতেই ভক্ত ও ভগবানের সম্পর্ক এবং যা কিছু লীলা।

স্বামী বিবেকানন্দ বলছেন, এই সংসার বা জগৎটা আমাদের মনের 'projection'; অর্থাৎ আমরা যেভাবে জগতকে দেখি বা দেখতে চাই, জগৎ আমাদের দৃষ্টিতে সেভাবেই ধরা দেয়। বাস্তবিকই তাই। আমরা ভাব দিয়েই জগৎ গড়ি এবং সেই মনোজগতেই বাস করি। তাই ভক্ত একভাবে জগতকে দেখেন, জ্ঞানী আর একভাবে। বিশুদ্ধ অদ্বৈতবাদী জ্ঞানীর তাত্ত্বিক ও নির্বাধ দৃষ্টিতে জগৎ নেই—এক ব্রহ্মবস্তুই আছেন। সেই 'এক' থেকেই এই আপাতপ্রতীয়মান বহুত্ব যা মিথ্যা ও অনিত্য অর্থাৎ যার কোনও পারমার্থিক সত্তা নেই। এই অদ্বৈতবাদে মায়ার অস্তিত্ব স্বীকার করা হয় না। মনোনাশের পর অদ্বৈতভূমিতে সমাধিস্থ হলে জ্ঞান-জ্ঞাতা-জ্ঞেয় এক হয়ে যায়। তখন নিত্য অবস্থা। সেখানে আস্বাদ্য ও আস্বাদকভেদ থাকে না। সে অবস্থার কথা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না।

শ্রীরামকৃষ্ণ অদ্বৈতবাদী হয়েও কিন্তু মায়ার ব্যবহারিক সত্তাকে মেনেছেন, কারণ যতক্ষণ আমাদের দেহবোধ আছে, আমিত্ব আছে, ততক্ষণ এই জগৎও আছে, লীলাও আছে। তাই তিনি বলেছেন, "আমি নিত্য ও লীলা, দুই লই।" "লীলা ধরে ধরে নিত্যে যেতে হয়; যেমন সিঁড়ি ধরে ধরে ছাদে উঠা। নিত্যদর্শনের পর নিত্য থেকে লীলায় এসে থাকতে হয়। ভক্তি-ভক্ত নিয়ে। এইটি পাকা মত।"[২] আবার বলছেন, "কে জানে বাপু, আমার এই একরকম অবস্থা। আমি কেবল নিত্য থেকে লীলায় নেমে আসি, আবার লীলা থেকে নিত্যে যাই।... সেই এক থেকেই অনেক হয়েছে—নিত্য থেকেই লীলা। এক অবস্থায় 'অনেক' চলে যায়, আবার 'এক'ও চলে যায়—কেননা এক থাকলেই দুই।... আবার যখন তিনি অবস্থা বদলে দেন—যখন লীলাতে মন নামিয়ে আনেন—তখন দেখি ঈশ্বর-মায়া-জীব-জগৎ—তিনি সব হয়ে রয়েছেন।"[৩] "সমাধিস্থ লোক সমাধি থেকে নেমে কোথায় দাঁড়াবে? তাই সত্ত্বগুণী ভক্ত নিয়ে থাকে।"[৪] ভাগবতেও বলা হয়েছে—"আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।/ কুর্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ॥" (১।৭।১০) ভগবানের এমনই মহিমা যে আত্মারাম জ্ঞানীরাও তাঁকে অকারণে ভালোবাসেন। শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায় : ভক্তির বীজ থাকলে আবার ফিরে ঘুরে হরি হরি হরিবোল। বলছেন—"আমি এক জ্ঞানীর পাল্লায় পড়েছিলুম, এগার মাস বেদান্ত শুনালে। কিন্তু ভক্তির বীজ আর যায় না। ফিরে ঘুরে সেই 'মা মা'!"[৫]

ঈশ্বর অনন্ত। তাই তাঁর লীলাও অনন্ত। কিন্তু তাঁর শ্রেষ্ঠ লীলা বোধ করি নরলীলা। যখন তিনি মানুষের শরীর ধারণ করে অবতীর্ণ হন, তখন তাঁর ভিতর দিয়ে আমরা প্রেম-ভক্তি আস্বাদন করতে পারি। তিনি যুগে যুগেই আসেন, যেমন শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, যিশু, বুদ্ধ, শ্রীচৈতন্য এসেছিলেন—ইদানীং শ্রীরামকৃষ্ণ। আমরা ঈশ্বরের অবতারকে চিনতে পারি না। তাই নিজমুখে তাঁদের পরিচয় দিতে হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর অন্তরঙ্গদের আত্মপরিচয় দিয়ে একাধিকবার বলেছেন, "যে রাম, যে কৃষ্ণ, সেই ইদানীং এই দেহে রামকৃষ্ণ।" শ্রীরামকৃষ্ণ আরও বলেছেন, "নরলীলায় অবতার। নরলীলা কিরূপ জান? যেমন বড় ছাদের জল নল দিয়ে হুড়হুড় করে পড়ছে। সেই সচ্চিদানন্দ, তাঁরই শক্তি একটি প্রণালী দিয়ে—নলের ভিতর দিয়ে—আসছে।"[৬]

গীতায় অর্জুনকে নিজের পরিচয় দিতে গিয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন :

"অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া॥" (৪।৬)

—"আমি জন্মরহিত, জ্ঞানস্বরূপ হয়েও, সমগ্র জগৎ যার বশীভূত, আমার সেই ত্রিগুণাত্মিকা শক্তিকে আশ্রয় করে নিজের মায়া দ্বারা যেন দেহধারণ করি।" অর্থাৎ, আমার জন্ম মায়িক—'জন্ম কর্ম চ মে দিব্যম্'—আমার

জন্ম ও কর্ম অলৌকিক। অবতাররূপী ভগবানের এই লীলা অতি অদ্ভুত। অবতারের জন্ম, শৈশব, কৈশোর, যৌবন, সাধনা, সিদ্ধি, স্বরূপ প্রকট করা, এমনকি অপ্রকট হওয়ার পরও সবটাই এই লীলার মধ্যে পড়ে। স্বামী সারদানন্দ তাই শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী লিখতে গিয়ে সেই মহাগ্রন্থের নাম দিয়েছেন 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাপ্রসঙ্গ'। অর্থাৎ শ্রীরামকৃষ্ণজীবনের লীলা ও তার ব্যাখ্যা তিনি ওই গ্রন্থে পরিবেশন করেছেন।

একটি প্রশ্ন

শ্রীরামকৃষ্ণের ঐশ্বর্যবিহীন লীলার কথা বলতে গেলে প্রথমেই মনে একটা খটকা লাগে। প্রশ্ন জাগে—ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ সত্যিই কি ঐশ্বর্যবিহীন ছিলেন? কারণ 'ঐশ্বর্য' কথাটিই এসেছে 'ঈশ্বর' থেকে। অর্থাৎ সত্যদৃষ্টিতে ঐশ্বর্য বলতে আমরা যা বুঝি, তা সবই ঈশ্বর বা ভগবানের। শ্রীরামকৃষ্ণ যদি সাক্ষাৎ ভগবান হন তো তাঁর 'ভগ' বা ঐশ্বর্য থাকবেই। তিনি নিজেই রহস্য করে বলেছেন—"যে বাবুর ঘর-দ্বার নাই, হয়তো বিকিয়ে গেল সে বাবু কিসের বাবু!... ঈশ্বর ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ। সে ব্যক্তির যদি ঐশ্বর্য না থাকত তাহলে কে মানত!"[৭] একদিক থেকে কথাটি ঠিক, কারণ যারা অত্যধিক বিষয়ের প্রতি আসক্ত, যারা কামিনী ও কাঞ্চনের পূজা করে, তারা ভগবানের চেয়ে ভগবানের ঐশ্বর্যের প্রতিই বেশি আকৃষ্ট হয়। শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায়, "...ঐশ্বর্য দেখেই সকলে ভুলে যায়, যাঁর ঐশ্বর্য তাঁকে খোঁজে না।"[৮] কেশব সেনকে একদিন তিনি অনুযোগ করে বলছেন, "ব্রহ্মজ্ঞানীরা অত মহিমা-বর্ণন করে কেন? 'হে ঈশ্বর, তুমি চন্দ্র করিয়াছ, সূর্য করিয়াছ, নক্ষত্র করিয়াছ!' এ-সব কথা এত কি দরকার? অনেকে বাগান দেখেই তারিফ করে। বাবুকে দেখতে চায় কজন। বাগান বড় না বাবু বড়?... কি জান? মানুষ নিজে ঐশ্বর্যের আদর করে বলে, ভাবে ঈশ্বরও আদর করেন। ভাবে, তাঁর ঐশ্বর্যের প্রশংসা করলে তিনি খুশি হবেন। শম্ভু বলেছিল, আর এখন এই আশীর্বাদ কর, যাতে এই ঐশ্বর্য তাঁর পাদপদ্মে দিয়ে মরতে পারি। আমি বললুম, এ তোমার পক্ষেই ঐশ্বর্য, তাঁকে তুমি কি দিবে? তাঁর পক্ষে এগুলো কাঠ মাটি!"[৯]

কথাটি ঠিক। শ্রীরামকৃষ্ণের কথা কাটবার জো নেই। তবুও আলোচনার স্বার্থে বলতেই হয় শ্রীরামকৃষ্ণের যোগলব্ধ ঐশ্বর্যের কোনও অভাব ছিল না। শাস্ত্র বলছেন, "ঐশ্বর্যস্য সমগ্রস্য বীর্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ।/ জ্ঞানবৈরাগ্যয়োশ্চৈব ষণ্ণাং ভগ ইতীঙ্গনা॥" ঐশ্বর্য, বীর্য, যশ, শ্রী, জ্ঞান ও বৈরাগ্য—এই ছটি যাঁর ভিতর পূর্ণভাবে আছে, তিনিই ভগবান। ভগবানের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বিষ্ণুপুরাণ আবার বলেছেন, "উৎপত্তিশ্চ বিনাশঞ্চ ভূতানামাগতিং গতিম্।/ বেত্তি বিদ্যামবিদ্যাঞ্চ স বাচ্যো ভগবানিতি॥" অর্থাৎ, যিনি ভূতগণের উৎপত্তি ও বিনাশ, পরলোকে গতি ও ইহলোকে আগমন, বিদ্যা ও অবিদ্যা অবগত আছেন, তিনিই ভগবান। সেদিক থেকেও শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনীপাঠক মাত্রই জানেন যে, পার্থিব সম্পদ ছাড়া তাঁর বাকি সব ঐশ্বর্যই ছিল। স্বামী বিবেকানন্দ থেকে শুরু করে শ্রীম পর্যন্ত অন্তরঙ্গ বহু ভক্তকেই তিনি বলে দিয়েছিলেন কোথা থেকে তাঁদের আগমন এবং কোথায় তাঁদের গতি। ভগবানের এইসব অপ্রাকৃত ঐশ্বর্যের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল তাঁর সাধনলব্ধ 'অষ্টসিদ্ধি'। কিন্তু এত যে ঐশ্বর্য, তার বাহ্যপ্রকাশ ঘটতে দিলেন না, কারণ জগন্মাতার বিশেষ উদ্দেশ্যসাধনের জন্যই এবার তাঁর বাহ্য ঐশ্বর্যের আড়ম্বরপরিশূন্য ও নিরক্ষর হয়ে দরিদ্র ব্রাহ্মণকুলে আবির্ভাব। অদ্বৈতসাধনে সিদ্ধ হয়ে তিনি এই কথা হৃদয়ংগম করেছিলেন।

সিদ্ধাই বা যোগৈশ্বর্যের প্রতি তাঁর বিতৃষ্ণা এত সহজাত ছিল যে তিনি ওগুলিকে বৃদ্ধা বারবনিতার বিষ্ঠা মনে করতেন। অন্তরঙ্গদের মধ্যেও সেই বিতৃষ্ণা সঞ্চারিত করার জন্য বলতেন—ওগুলোর দিকে একদম মন দিসনি; ওগুলো ভগবানলাভের পথে ঘোর অন্তরায়। শ্রীরামকৃষ্ণের দু-একটি জীবনীগ্রন্থ যা প্রথমদিকে প্রকাশিত হয়েছিল, সেখানে শ্রীরামকৃষ্ণের অলৌকিক কিছু কিছু ক্রিয়াকলাপ বর্ণিত হওয়ায় স্বামীজী অত্যন্ত বিরক্ত হয়েছিলেন।

আলাসিঙ্গাকে একটি চিঠিতে তিনি লিখছেন (৩০ নভেম্বর ১৮৯৪): "রামকৃষ্ণের অলৌকিক ক্রিয়া সম্বন্ধে কি পাগলামি হচ্ছে? আমার অদৃষ্টে সারাজীবন

দেখছি—গরু-তাড়ানো ঘুচল না। মস্তিষ্কহীন আহাম্মকগুলো কেন যে এই বাজে আজগুবীগুলো লেখে তা জানিও না, বুঝিও না। মদকে 'ডি. গুপ্তের ঔষধে' পরিণত করা ছাড়া কি রামকৃষ্ণের জগতে আর কোন কাজ ছিল না?... এ-সব লোক ভগবান্‌কে জানতে চায়—এদিকে রামকৃষ্ণের ভেতর বুজরুকি ছাড়া আর কিছু দেখতে পায় না! খাজা আহাম্মকি! এ রকম আহাম্মকি দেখলে আমার রক্ত টগবগ ফুটতে থাকে।"

মঠের ভাইদেরও রেয়াত করেননি। একটি চিঠিতে লিখছেন (১৮৯৪) : "তোমাদের আক্কেল বুদ্ধি এক পয়সাও নাই। Indian Mirror-কে 'পরমহংস মশায় নরেনকে হেন বলতেন, তেন বলতেন' কেন বলতে গেলে? আর আজগুবি ফাজগুবি যত—পরমহংস মশায়ের বুঝি আর কিছুই ছিল না? খালি thought-reading (পরের মনের কথা বলতে পারা) আর nonsense (বাজে) আজগুবি! দু-পয়সার brain (মস্তিষ্ক)-গুলো! ঘৃণা হয়ে যায়।"

শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলার মূল সুর

বাস্তবিক শ্রীরামকৃষ্ণজীবনের মূল উদ্দেশ্যটি বা তাঁর লীলার মূল সুরটি ধরতে না পারাতেই স্বামীজীর এত তীব্র কশাঘাত। আমার সামান্য বুদ্ধিতে মনে হয় এবার শ্রীরামকৃষ্ণ অবতারের শ্রেষ্ঠ সংযোজন তাঁর হাটে হাঁড়ি ভাঙার খেলা। এবারে তিনি সোজাসুজি চোখে আঙুল দিয়ে জীবের স্বরূপ দেখিয়ে দিয়েছেন এবং বলে দিয়েছেন—এ জন্মেই ঈশ্বরলাভ করো এবং তা খুবই সম্ভব। ঈশ্বরলাভের অর্থও পরিষ্কার করে দিয়েছেন। বলেছেন—ঈশ্বরলাভ মানে ঈশ্বর হয়ে যাওয়া, ঈশ্বরের মতো চরিত্র তৈরি করা। অলৌকিকত্বের পিছনে ছোটা নয়, স্বর্গটর্গ নয়, ওসব ত্যাগ করে নিজের স্বরূপটি আবিষ্কার করো। তাঁর সমগ্র জীবন ও কর্মের মধ্য দিয়ে মানবজাতির উদ্দেশ্যে এই ডঙ্কামারা চরম বাণীই নিয়ত ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়েছে।

এবার তাঁর লীলার বৈশিষ্ট্যের কথা বলতে গিয়ে তিনি নিজেই বলেছেন—'এবার সত্ত্বগুণের ঐশ্বর্য'। সত্ত্বগুণে শুধু শুদ্ধ ভগবৎপ্রেম ও ভাবের খেলা। বাইরের চাকচিক্য বা লক্ষণ দেখে এই ভাবের খেলা হৃদয়ংগম করা যায় না। রাম অবতারে রজোগুণের বাহ্য ঐশ্বর্য ছিল। রাজার পুত্র, রাজপ্রাসাদ, মাথায় স্বর্ণমুকুট, কাঁধে তীর-ধনুক, রাবণ ও অন্যান্য অসুর নিধন, রাজকার্য পরিচালনা এবং অন্যান্য বহুবিধ অলৌকিক শক্তির প্রকাশ ছিল। কৃষ্ণ অবতারেও সেই। ক্ষত্রিয় রাজপুত্র বুদ্ধের বুদ্ধত্বলাভের আগে রাজকীয় বিলাস ও ভোগসুখের ঘটাপটা ছিল, ছিল পাণ্ডিত্য। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের ছিল চোখঝলসানো রূপ, দুর্জয় পাণ্ডিত্য। সত্ত্বগুণের কিছু কমতি না থাকলেও তাঁর জীবনেও অলৌকিক বিভূতির ভূরি ভূরি প্রকাশ ঘটেছে। ভগবান যিশু অকিঞ্চনের ঘরে জন্মেছিলেন সত্য, কিন্তু তাঁর দেবত্বের মহিমা অনুগামীদের দৃষ্টিতে যেন ব্যক্ত হয়েছে অসাধ্য রোগযন্ত্রণা নিরাময়ের মাধ্যমে। অবশ্য একথার অর্থ এই নয়—তাঁদের মধ্যে সত্ত্বের প্রভা ছিল না। অবশ্যই ছিল। সত্য, দয়া, প্রেম, করুণা, ক্ষমা ইত্যাদি প্রভূত পরিমাণেই ছিল কিন্তু যুগের প্রয়োজন অনুযায়ী তাঁরা আপন-আপন ছদ্মবেশ ধারণ করে যে যার কাজ করে গেছেন। কিন্তু রামকৃষ্ণ অবতারে দেখি শুদ্ধ অনুরাগের ঐশ্বর্য, অন্তরের বৈভব যা সাধারণের চোখে ধরা পড়ে না। এবার তিনি 'অচিনে গাছ', এমন গাছ যে গাছ প্রায় সকলেরই অজানা, অচেনা। রূপের ছটায় ভুবন আলো করা নেই, সিদ্ধাই দেখানো নেই, যুদ্ধবিগ্রহ নেই, পুঁথিপড়া শাস্ত্রীয় পাণ্ডিত্য নেই, অন্যের মত খণ্ডন করে নিজের মত প্রকাশ্যে প্রচার করা নেই, কোনও ধর্মকে নস্যাৎ করা নেই—এবার দীন-হীন নিরক্ষর, মায়ের সন্তান সেজে তিনি 'পূর্ণ নিরভিমানের অবতার।'[১০] পুঁথিকার অক্ষয়কুমার সেন শ্রীরামকৃষ্ণমহিমা অনুধ্যান করতে গিয়ে বলেছেন : 'রামকৃষ্ণ আদর্শাবতার'।[১১] কেন? তার উত্তরে বলেছেন যে আদর্শ অবতারের ঐশ্বর্য ব্যক্ত থেকেও থাকে না। থাকে কেবল মাধুর্য। তিনি নিরৈশ্বর্যে ঐশ্বর্যবান এবং অরূপে রূপবান। তিনি লক্ষণাতীত; তাই তাঁকে চেনা এত কঠিন। অক্ষয় তাঁর 'পুঁথিতে' লিখেছেন :

"ঐশ্বর্য দেখিয়া তত্ত্ব করিতে নির্ণয়।
তোর মত সন্দ যেন মোর নাহি হয়॥...
আরে মন নিরৈশ্বর্য দেখে পেলি ধোঁকা।
সেই রাম এই রামকৃষ্ণরূপে ঢাকা॥...
আরে মন নিরৈশ্বর্য দেখে পেলি ধোঁকা।
সেই কৃষ্ণ এই রামকৃষ্ণরূপে ঢাকা॥
সেই রাম সেই কৃষ্ণ রামকৃষ্ণ সাজে।
লীলান্তরে রূপান্তর আপনার কাজে॥
রূপান্তর মাত্র কিন্তু গুণান্তর নয়।
মহল্লীলা শ্রীপ্রভুর সাক্ষী পরিচয়॥
যখন যেরূপ সাজ হয় দরকার।
সে রূপে সে সাজে অবতীর্ণ অবতার॥"[১২]

পৌরাণিক যুগে অবতারদের চতুর্ভুজ, ষড়্ভুজ, হাতে সুদর্শনচক্র, অলংকারবিভূষিত দেহ ইত্যাদি দেখে বোঝা যেত ভগবান অবতীর্ণ হয়েছেন। রাক্ষস বা অসুরদের চেহারাও তখন নাকি অন্যরকম ছিল। হয়তো মাথায় শিং এবং হাতির মতো বিশাল দাঁত থাকত তাদের। কিন্তু এযুগে শরীরের লক্ষণ দেখে মানুষ আর দেবতার, ভগবান আর অসুরদের পার্থক্য বোঝা যায় না। তাহলে বোঝা যাবে কীসে? তার উত্তর—কর্ম ও চরিত্র দেখে। তাই শ্রীরামকৃষ্ণরূপী ভগবান এবার কেবল একটি অনুপম চরিত্র দেখিয়ে গেলেন এবং চরিত্রগঠনই যে যথার্থ ধর্ম ও দেবত্ববিকাশের একমাত্র পথ তার সুলুকসন্ধান বলে দিলেন। নিজের জীবন দিয়ে এই পরম সত্যটি উদ্ঘাটনের জন্য যা করে গেলেন, সেটিই তাঁর এবারের লীলা। এই লীলার বৈশিষ্ট্য বাইরের ঐশ্বর্য বর্জন এবং আন্তর ঐশ্বর্যের উন্মোচন। বাইরের ঐশ্বর্য বর্জন হচ্ছে ত্যাগ ('নেতি, নেতি') এবং আন্তর-ঐশ্বর্যের উন্মোচন হল সত্য, পবিত্রতা, প্রেম, অহংশূন্যতা, করুণা, ক্ষমা ইত্যাদি দিব্য গুণের বিকাশ যা আমাদের ভিতরেই সুপ্ত আছে ('ইতি, ইতি')।

লীলার দৃষ্টিকোণ থেকে শ্রীরামকৃষ্ণের সামগ্রিক জীবনটিকে বিচার করলে আটটি পর্যায়ে ভাগ করা যায়। পর্যায়গুলি যথাক্রমে 'জন্মলীলা' যার মধ্যে পড়ে তাঁর দিব্য জন্ম ও পরবর্তী ক্রিয়াকলাপ; কামারপুকুরে স্বজন ও প্রতিবেশীদের সঙ্গে 'বাল্যলীলা'; বন্ধুদের সঙ্গে 'কৈশোরলীলা'; 'যৌবনলীলা' যার অন্তর্ভুক্ত অভূতপূর্ব সাধন ও দাম্পত্যলীলা; সাঙ্গোপাঙ্গ, রসদদার ও ভক্তদের নিয়ে 'দক্ষিণেশ্বর পর্বের লীলা'; 'তীর্থভ্রমণলীলা'; রোগশয্যায় 'অন্ত্যলীলা' এবং সবশেষে 'অপ্রকটলীলা' যার চূড়ান্ত অভিব্যক্তি আত্মপ্রকাশে অভয়দান, অর্থাৎ একদিকে জগতের সামনে নিজের স্বরূপ উদ্ঘাটন করা এবং অন্যদিকে জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে জগতের সকলকে তাদের স্বরূপসন্ধানে উদ্বুদ্ধ করা এবং ঠারেঠোরে বলে দেওয়া—আমিও যে তোমরাও সে। শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতিটি পর্যায়ের যে লীলা তা অতুলনীয় বৈচিত্র্যের রসে সিক্ত হলেও তার সবকটি একসূত্রে গাঁথা। সেই সূত্রটি ঈশ্বর, ঈশ্বরচিন্তা, ঈশ্বরের প্রতি প্রেম ও ঈশ্বরানুভূতির রেশমি তন্তু দিয়ে তৈরি। এককথায় বলতে গেলে তাঁর যাবতীয় লীলার একটিই উদ্দেশ্য—লোকসংগ্রহ অর্থাৎ মানুষকে অসৎ পথ থেকে নিবৃত্ত করা এবং সৎপথে বা স্বধর্মে প্রবৃত্ত করা।

শ্রীরামকৃষ্ণের ঐশ্বর্যবিহীন লীলার এই মূল সুরটি আমাদের কাছে অনাবৃত করেছেন শ্রীমা সারদা দেবী স্বয়ং। তিনি বলেছেন : "মানুষ তো ভগবানকে ভুলেই আছে। তাই যখন যখন দরকার, তিনি নিজে এক একবার এসে সাধন করে পথ দেখিয়ে দেন। এবার দেখালেন ত্যাগ।"[১৩] "তাঁর ত্যাগই ছিল ঐশ্বর্য।"[১৪] "এই যুগে তাঁর ত্যাগই হলো বিশেষত্ব। ওরকম স্বাভাবিক ত্যাগ কি আর কখনো কেউ দেখেছে?... অন্যান্য বারে একটা ভাবকেই বড় করায় অন্য সব ভাব চাপা পড়েছিল।"[১৫] বরিশালের দীক্ষিত ভক্ত ডা. সুরেন্দ্রনাথ রায়কে একদিন তিনি বলছেন : "আমি বলছি, তোমরা ধন্য যে এমন সময় জন্মেছ। তাঁর লীলাখেলা দেখার সময় এখন। শ্রদ্ধা ও ভক্তির চোখে দেখলে সবই সহজ।"[১৬]

স্বামীজীর বিশ্লেষণ

শ্রীশ্রীমা মৃদু দু-একটি কথায় শ্রীরামকৃষ্ণের লীলার খেইটি ধরিয়ে দিয়েছেন। স্বামীজী কিন্তু সেখানেই থেমে থাকেননি। তিনি তাঁর বিশ্লেষণের সৌর তেজটি একাগ্র করে প্রক্ষেপ করেছেন শ্রীরামকৃষ্ণের মৌলিক চরিত্রের

ওপর, যাঁর পবিত্রতা, প্রেম আর ঐশ্বর্যের এককণামাত্র রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, যিশু বা চৈতন্যে প্রকাশিত।[১৭] স্বামী শিবানন্দকে লিখছেন (১৮৯৪) : ''ভগবান শ্রীকৃষ্ণ জন্মেছিলেন কিনা জানি না, বুদ্ধ চৈতন্য প্রভৃতি একঘেয়ে, রামকৃষ্ণ পরমহংস the latest and the most perfect।'' কেন? উত্তরে বলছেন, ''জ্ঞান, প্রেম, বৈরাগ্য, লোকহিতচিকীর্ষা, উদারতার জমাট; কারুর সঙ্গে কি তাঁহার তুলনা হয়? তাঁকে যে বুঝতে পারে না, তার জন্ম বৃথা।''

আর এক চিঠিতে স্বামীজী গুরুভাইদের লিখছেন (১৮৯৫) : ''রামকৃষ্ণাবতারে জ্ঞান, ভক্তি ও প্রেম। অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত প্রেম, অনন্ত কর্ম, অনন্ত জীবে দয়া। তোরা এখনও বুঝতে পারিসনি।'' দেওয়ান হরিদাস বিহারীদাস দেশাইকে লিখেছেন (২৯ জানুয়ারি ১৮৯৪), শ্রীরামকৃষ্ণ ''আপনাদের ইতিহাসে বর্ণিত সমুদয় অবতারপ্রথিত পুরুষগণ অপেক্ষা শত শত গুণে অধিক পবিত্র... যে পুরুষপ্রবর জীবনে, চিন্তায় বা কর্মে লেশমাত্র অপবিত্র কিছু করেন নাই...।'' আর এক পত্রে (২৭ এপ্রিল ১৮৯৬) : ''সার এই যে, পরমহংসদেব চরিত্রসম্বন্ধে পুরাতন ঠাকুরদের উপরে যান এবং শিক্ষাসম্বন্ধে সকলের চেয়ে উদার ও নূতন এবং progressive (প্রগতিশীল)... একাধারে যোগ জ্ঞান ভক্তি ও কর্ম... ও সকল কেষ্ট বিষ্টু বেশ ঠাকুর ছিলেন; কিন্তু রামকৃষ্ণে একাধারে সব ঢুকে গেছেন।'' অর্থাৎ শ্রীরামকৃষ্ণ এমন একটি খাঁটি চরিত্র, এমন দেবমানব, যিনি এবং যাঁর জীবনাদর্শ এযুগের যুক্তিশীল মানুষকে পথ দেখাতে পারে; এবং দেখাচ্ছেও। এখন এই নিখুঁত চরিত্রের ছাঁচে তাই আমাদের জীবন গড়তে হবে। শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলার মহিমা কীর্তন করতে গিয়ে স্বামীজী শিবানন্দজীকে আরও লিখছেন (১৮৯৪)—''ভায়া, যীশুখ্রীষ্টকে জেলে-মালায় ভগবান্ বলেছিল...। রামকৃষ্ণকে জীবদ্দশায়—নাইনটিন্থ সেঞ্চুরির শেষভাগে ইউনিভার্সিটির ভূত ব্রহ্মদত্যিরা ঈশ্বর বলে পূজা করেছে।'' কিন্তু কেন? তার কারণ তাঁর শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ চরিত্র। সেই চরিত্রবলেই, স্বামীজী বলেছেন, 'পাগলা বামুন' লোকের মনগুলোকে কাদার তালের মতো ভেঙেচুরে নতুন ছাঁচে ফেলতেন। যদি miracle বলতে হয় তো এটাই ছিল তাঁর greatest miracle। এটাই তাঁর মহত্তম লীলা। এ লীলা আজও চলছে। 'কোন কোন ভাগ্যবানে দেখিবারে পায়'। শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজী জানতেন এ লীলা সুদীর্ঘকাল চলবে। তাই বুক বাজিয়ে স্বামীজীকে বলতে শুনি (১৫ জুন ১৮৯৭)—''লোকে দেখুক, আমাদের প্রভুর পাদস্পর্শে লোকে দেবত্ব পায় কি না!''

মা ও স্বামীজীর ভবিষ্যদ্‌বাণী কি মিথ্যা হবার? শ্রীরামকৃষ্ণের শুদ্ধভাবের আশ্রয়ে এসে, তাঁর শরণ নিয়ে, তাঁকে ভালোবেসে কত সাধারণ মানুষ এই দুর্নিবার ভোগলালসা ও মোহান্ধকারজনিত স্বার্থলোলুপতার যুগেও দেবতা হয়ে যাচ্ছেন, পরমানন্দ ও শান্তি লাভ করে আপ্তকাম হচ্ছেন, তার খবর আমরা কজনই বা রাখি? কিছু হচ্ছে যে, এটা সুনিশ্চিত। শ্রীরামকৃষ্ণের ঐশ্বর্যবিহীন লীলার এটিই মহত্তম পরিচয় ও সার্থকতা। ✠

তথ্যসূত্র

১। শ্রীম, *শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত* (উদ্বোধন কার্যালয় : কলকাতা, ২০০১), অখণ্ড, পৃঃ ৪৩৭

২। তদেব, পৃঃ ২২৮

৩। তদেব, পৃঃ ২৯১

৪। তদেব, পৃঃ ৩০৫

৫। তদেব, পৃঃ ৮৩৪

৬। তদেব, পৃঃ ৩৫১

৭। তদেব, পৃঃ ৫১

৮। তদেব, পৃঃ ৩৫

৯। তদেব, পৃঃ ৩০৬-৭

১০। দ্রঃ স্বামী প্রেমানন্দ, *শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব*, ব্রহ্মচারী জ্ঞান প্রকাশিত পুস্তিকা

১১। অক্ষয়কুমার সেন, *শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-মহিমা* (উদ্বোধন কার্যালয় : কলকাতা, ২০০৮), পৃঃ ৩৫

১২। তদেব, পৃঃ ৩৬-৩৭

১৩। *শ্রীশ্রীমায়ের কথা* (উদ্বোধন কার্যালয় : কলকাতা, ২০০৩) অখণ্ড, পৃঃ ২৬১

১৪। তদেব, পৃঃ ২১৪

১৫। তদেব, পৃঃ ২৭৯

১৬। তদেব, পৃঃ ৩৪৭

১৭। *দ্রঃ* স্বামী বিবেকানন্দ, *পত্রাবলী*, (উদ্বোধন কার্যালয় : কলকাতা, ১৯৮৭) পৃঃ ৩৭৭